

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আলম (তামান্না)

রোলঃ 23090120532

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আলম (তামান্না)

রোলঃ 23090120532

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আলম (তামান্না),
আইডিঃ 23090120532 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ জোবায়ের হাসান

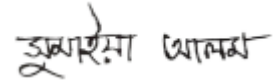
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া আলম (তামান্না)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120532

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবতের সংজ্ঞা	6
গীবত সংক্রান্ত কিছু হাদিস	8
গীবতের পূর্বের দুটি স্তর	8
গীবতের প্রকারভেদ	9
ইসলামী শরীয়াতে গীবত ও নামীমাহর বিধান	23
গীবত শ্রবণ করাও হারাম	26
গীবতে লিগু হওয়ার কারণ ও পরিত্রাণের উপায়	28
গীবতের কুফল/ক্ষতি	45
গীবতের বৈধ প্রকারসমূহ	56
গীবতকারীকে বাঁধা দেওয়ার ফজীলত	60
এক নজরে পরিত্রাণের উপায়সমূহ	62
গীবতের কাফ্ফারা	73

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গীবতের সংজ্ঞা

গীবত একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করেছেন। তবে তাতে শুধু শাদিক পার্থক্য দেখা যায়, মৌলিক কোন ভিন্নতা নেই।

শরীয়তের পরিভাষায় গীবত বলতে বোঝানো হয় কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলা, যা শুনলে সে কষ্ট বা অপমান বোধ করবে। তা মুখে, লেখনীতে, ব্যঙ্গ করে কিংবা অন্য যে প্রকারেই করা হোক না কেন তা গীবত বলেই গণ্য হবে।

ইমাম নববী (র) বলেন,

“গীবত হচ্ছে একজন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কোন দোষ-ত্রুটি অন্যের সামনে বর্ণনা ও আলোচনা করা; যা প্রকাশিত হোক তা সে চায় না। সে দোষ-ত্রুটি তার শারীরিক হোক অথবা চারিত্রিক, দুনিয়াবি হোক অথবা দ্বীনী, সৃষ্টিগত হোক অথবা বৈশিষ্ট্যগত, ধনসম্পদে হোক অথবা পিতা-পুত্রের ব্যাপারে, স্ত্রীর হোক অথবা খাদেমার, পোশাক পরিচ্ছেদে হোক অথবা চলাফেরায়, তার হাস্যোজ্বল কিংবা গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার হোক ইত্যাদি বিষয় যা তার সাথে সম্পৃক্ত। আর এই আলোচনা ও বিবরণ মুখের ভাষায় হোক বা লেখনীর মাধ্যমে অথবা ব্যঙ্গাকৃতি প্রকাশের মাধ্যমে হোক অথবা হাত, মাথা ও চক্ষুর ইশারার মাধ্যমে কিংবা যে কোন মাধ্যমে হোক।”

(ইমাম নববী, আল-আযকার; পৃ-৫৩৪)

উল্লেখ্য, বর্ণিত দোষ যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তাহলে তা গীবত হবে; অন্যথায় তা মিথ্যা অপবাদ হবে।

ভ্রান্ত ধারণা:

অনেকে বলে থাকেন, কারো সামনে তার কোনো দোষ বললে সেটা গীবত হবে না। শুধু কারোর দোষ তার অগোচরে বললে গীবত হবে। আবার অনেকে গীবত করে একথা বলে

থাকে যে, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারব। একথার দ্বারা মূলত গীবতের বৈধতার স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সামনে বলে কষ্ট দেওয়াটাও গীবতের মতো কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তা হচ্ছে মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়া। আর তার অনুপস্থিতিতে বললে তো গীবতই।

আবার কেউ কেউ মনে করে যে, আমি তো বাস্তব কথাই বলছি। যারা এরূপ ধারণা নিয়ে কারো দোষের প্রকাশ করেন, তারাই গীবত করেন। কারণ, বর্ণিত দোষ যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তাহলে তা গীবত হবে; অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে, যা গীবতের চাইতেও বড় গুনাহ।

গীবত ও নামীমাহ্ এর মধ্যে পার্থক্য:

গীবত : কারো দোষ গুণ অন্যের কাছে বর্ণনা করাকে গীবত বলে।

নামীমাহ্: ঝগড়া বা ফ্যাসাদ সৃষ্টি বা বদনামী করার উদ্দেশ্যে কারোর কাছে কথা বলাকে নামীমাহ বা চুগলখোরি বলে।

ইমাম নববী (র) বলেন,

“ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট ছড়িয়ে বেড়ানো (এটাই হলো চুগলী বা চুগলখোরি)।”

(ইমাম নববী, কিতাবুল আযকার; পৃ-৩৩৬)

তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম (رَحْمَةُ اللهِ) বলেন,

“প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তো গীবত করলে, অন্যথায় তা মিথ্যা অপবাদ।”

-[ইমাম মুহাম্মদ (رَحْمَةُ اللهِ) কিতাবুল আসার]

গীবত সংক্রান্ত কিছু হাদিস

১। এক খাটো মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে আগমন করেন। মহিলা চলে গেলে আম্মিজান আয়িশাহ (رضي الله عنها) তার বেঁটে হওয়ার দোষ বর্ণনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আয়িশাহ! তুমি তো তার গীবত করলে!” আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তো তার কোনো অবান্তর দোষ বর্ণনা করিনি। শুধুমাত্র খাটো হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছি।” আয়িশাহ (رضي الله عنها) -এর জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

“যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু যখনই তুমি তার খাটো হওয়ার দোষ বর্ণনা করেছ, তখন এটাই গীবত হয়ে গেল।”

(তাস্বীহুল গাফেলীন)

২। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে (رضي الله عنهم) জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা জানো, গীবত কাকে বলে?” সাহাবীরা বললেন, “আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (ﷺ) ভালো জানেন।” উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এ গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে।” সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ! (ﷺ) বর্ণনাকৃত দোষ যদি সে ভাইয়ের মাঝে থাকে তা হলেও কি গীবত হবে?”

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

“যদি তোমরা কারো সঠিক দোষ বর্ণনা কর তবেই তা গীবত, অন্যথায় তা মিথ্যা অপবাদ হবে।”

(সহীহ মুসলিম)

গীবতের পূর্বের দুটি স্তর

গীবতের মত হারাম কাজে লিপ্ত হবার পূর্বে আরো দুটি ঘণিত ও নিন্দনীয় স্তর পাড়ি দিতে হয়।

(১) কু-ধারণা

(২) গোয়েন্দাগিরি

মানুষ সাধারণত কারো ব্যাপারে প্রথমে একটু ধারণা করে, তারপর সেই ধারণাকে কু-ধারণায় পরিণত করে। অতঃপর, সেই কু-ধারণাকে সম্বল করে গোপনীয় বিষয় তালাশ করতে থাকে অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরি করতে থাকে। অতঃপর সেই ধারণা অনুযায়ী কিয়দংশ পেয়ে গেলেই তা নিয়ে গীবতের মত জঘন্য হারামের দরজায় প্রবেশ করে। উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের উপর মহান আল্লাহ্ তায়ালা চরম হুশিয়ারী উল্লেখ করেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ ۖ نَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۚ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থেকে। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ। আর গুপ্তচরবৃত্তি করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো অসাক্ষাতে নিন্দা না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই কর। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত:১২)

গীবতের প্রকারভেদ

গীবতকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগ: জীবিতদের গীবত।

এটা তিন প্রকার:

১ মুসলমানের গীবত।

২। যিম্মী (অমুসলিমদের) গীবত।

৩। হারবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত।

১। মুসলমানের গীবত:

কোনো মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ ۖ نَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক অনুমান থেকে দূরে থেকে। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ। আর গুপ্তচরবৃত্তি করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো অসাক্ষাতে নিন্দা না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই কর। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত:১২)

আয়াতের মর্মার্থ হলো এই, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের গীবত না করে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত,সম্মান ও সম্পদ নষ্ট করা হারাম।”

(মুসনাদে আহমদ)

গীবত করার দ্বারা এক মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানের সম্মান নষ্ট করা হয়। তাই এটিকে স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রকাশ্যে কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত এমন ফাসেক পাপাচারী মুসলিমের গীবাত জায়েয।

২। যিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকের গীবাত:

যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবাতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই সম্মানীয় হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম; অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম। দোররে মোখতারসহ অন্যান্য ফেকাহ গ্রন্থে এ মাসআলা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সুতরাং, যিম্মিদের গীবাত করাও হারাম।

৩। হারবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবাত:

ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান মতে,

যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ নয়, তাদের গীবাত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবাত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবাত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে। যারা মুসলমানদের শত্রু তাদের গীবাত করলে, দোষারোপ করলে কোনো গুনাহ হবে না।

দ্বিতীয় ভাগ: মৃতদের গীবাত।

জীবিত মানুষদের নিয়ে গীবাত করা যেমন হারাম, তেমনি মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবাত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক না কেন।

জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবাত থেকেও বিরত থাকতে রসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর তাকিদ করেছেন। এ সম্পর্কিত কিছু হাদিস:

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না।”

(আবু দাউদ-কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“তোমরা ইহুদিদের গালি দিওনা। কেননা, তারা নিজেদের আমলের প্রতিদানপ্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছে।”

(কিতাবুত তারগীব ওয়াততারহীব)

রসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

“তোমরা নিজেদের মৃতদের সৎগুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গোনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট।”

(এহইয়াউল উলুম)

একটি ঘটনা ও উপদেশ

ঘটনা: সম্মানিত বুয়ুর্গগণের মধ্য থেকে এক ওলীউল্লাহ হযরত মাওলানা এযহারুল হক সাহেব লখনৌভি ইনতেকাল করেন। ইনতেকালের সময় তাঁর মুখ থেকে কালেমা বের হয়নি। ইনতেকালের পর উপস্থিত লোকজন তাঁর গায়ের উপর চাদর ছড়িয়ে দিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থাপনায় লেগে যায়। উপস্থিতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ভর্ৎসনার সূরে বলল, প্রকাশ্যে তো নেহায়েত মোত্তাকী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে মুখ থেকে কালেমাও বের হল না! এতে সবাই মনে খুব ব্যথা পান। ইত্যবসরে মরহুম মাওলানা সাহেব তাঁর পদদ্বয় সোজা করে সশব্দে কালেমা শরীফ পড়েন। উপস্থিত লোকজনের কানে মাওলানা সাহেবের কালেমা পাঠের আওয়াজ পৌঁছার পর যারা মুখে কালেমা উচ্চারিত না হওয়ায় ভৎসনা করেছিল, উপস্থিতরা ভর্ৎসনাকারীদেরকে খুবই তিরস্কার করেন।

উপদেশ: মৃত্যুকালে কারো মুখ থেকে কালেমা বের না হলে, অথবা চেহারা কালো হয়ে গেলে, অথবা কবরে আযাবের কোন উপকরণ পরিদৃষ্ট হলে, অথবা ভূগর্ভস্থ কোন জীব যেমন সাপ বিছু ইত্যাদি প্রকাশ পেলে যারা এ বিষয়ে অবহিত হয়, তাদের উচিত এসব জনসাধারণ এর মাঝে প্রকাশ না করা। উপরন্তু তার গোনাহগার হওয়ার সংবাদও ফলাও না করা, এতে তার জীবিত আত্মীয় স্বজন কষ্ট পাবে।

তৃতীয় ভাগ :

এ ভাগের গীবত দুই প্রকার:

- (১) বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত
- (২) পাগলের গীবত

(১) বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত:

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (رَحْمَةُ اللهِ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (رَحْمَةُ اللهِ) আল্লামা ইবনে হাজার (رَحْمَةُ اللهِ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ বাচ্চাদের এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমনভাবে প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম। অর্থাৎ, যাদের বুঝ হয়নি তাদের নিয়ে কোনো দোষ-ত্রুটি বলাও গীবত।

(২) পাগলের গীবত:

যেসব পাগলকে কিছু বললেও বুঝেনা, প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয। কিন্তু কারোর গীবত না করাই উত্তম। কিছু মনিষী বলেন, আমরা পাগলদের নিয়ে গীবত করবো না। যার ফলে আমরা গীবতের বিষয়টা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ ভাগ:

এ ভাগের গীবতসমূহ ছয় প্রকার:

১। দৈহিক কাঠামোর গীবত

২। পোশাক পরিচ্ছদের গীবত

৩। বংশের গীবত

৪। অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত

৫। এবাদতে গীবত

৬। গোনাহের গীবত

১। দৈহিক কাঠামোর গীবত:

কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক গীবত করা, যেমন- এরূপ বলা, অমুক স্থূলকায়, বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ ছোট, ঘোর কালো, একেবারে বধির, কারো কথাই শুনতে পায় না, অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না, তার নাক কাটা, লম্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বড়, অথবা সে বিদ্বী, এভাবে কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা এবং তাকে তুচ্ছ করার উদ্দেশ্যে হাসা প্রভৃতি গীবত; সুতরাং হারাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (رضي الله عنه) এরশাদ করেন,

“আল্লাহ্ তায়ালা মৃতের গোশত হারাম করেছেন, তেমনি কোন মোমেনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গীবতও হারাম করেছেন।”

(তায়ফসীরে দোররে মনসূর)

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো -

প্রথম ঘটনা:

একদা আল্লামা ইবনে সিরীন (রঃ) এক লোকের দোষ বর্ণনায় বলেন, “সে কালো।” অতঃপর বললেন, “আমি মনে করি আমি তার গীবত করেছি। সুতরাং এ গোনাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।”

দ্বিতীয় ঘটনা:

হযরত উম্মে সালামা (رضي الله عنه) খর্বাকৃতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীগণ হাসাহাসি করতে শুরু করলে আল্লাহ তা’আলা ওহী নাযিল করলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

অর্থ: হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ অন্য পুরুষকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম। তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না। ঈমানের পর অপনাম বড় খারাপ! যারা তওবা করে না তারা ই জালেম।

(সূরা হুজুরাত:১১)

তৃতীয় ঘটনা:

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে,
এক ব্যক্তির ভারী দেহের কথা আলোচিত হওয়ায় তিনি দস্তুরখান ছেড়ে চলে আসেন। এর কারণ, যে মজলিসে কারো গীবত হয়, সেখানে অবস্থান করা বা সে মজলিসে বসে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন- কোথাও নাচের আসর চললে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

(তাতারখানিয়া হতে রদ্দুল মোহতার)

২। পোশাক পরিচ্ছদের গীবত:

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন- এরূপ বলা, অমুক অত্যন্ত কৃপণ, 'কৃপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন- রেশমী কাপড় অথবা দুষ্ট বদমাশ প্রকৃতির লোকদের মত অঙ্গরাখা পরিধান করে, অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে বুলে থাকে, অমুক মেয়েলোক এভাবে দোপাট্টা জড়িয়ে থাকে যে, তার সতর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে পরিধান করে যে, পেট উদাম থাকে, অথবা অমুক মেয়েলোক এমনভাবে চলে যে, মানুষ তার সত্তর দেখতে পায়, অথবা অমুকের পোশাক অত্যন্ত ছোট বা বড় - এসবই গীবত।

নিম্নে পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হল-

একদা আন্মিজান আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, “অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা।” এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, “আয়িশাহ! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যিক।” হযরত আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, “থুথু ফেললে আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়।”

(আততারগীব ওয়াততারহীব)

৩। বংশের গীবত:

তুচ্ছ বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি, অমুক বংশ অথবা অমুক শহরের লোকদের বংশধারা ভাল নয়। তাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ হীন নীচ বংশীয় ছিল, অথবা তাদের বংশধারা অজ্ঞাত, এতেও গীবত হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

“দ্বীন এবং নেক আমল ব্যতীত কারো উপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।”

অতএব, নিজের বংশ গৌরব প্রকাশ এবং অন্যের বংশের দোষ বর্ণনা, হয়ে তুচ্ছ সাব্যস্ত করা নিতান্ত নিকৃষ্ট স্বভাব।

৪। অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত:

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা- সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অত্যন্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের পরামর্শে চলে, সে স্বামী/স্ত্রীর অনুগমন করে চলে অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা গীবত।

কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে গীবত, সে সম্পর্কে নিচে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে:

একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন- “লোকটা খুব বেশী ঘুমায়।” অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ ! হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।” জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন, “তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে।” তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ ! আজ আমরা কি খেলাম?” তিনি এরশাদ করলেন, “আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি।” এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।”

তিনি বললেন,

“শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়।”

(তাফসীরে দোররে মনসূর, জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

৫। ইবাদতের গীবত:

অমুক ভালোভাবে নামায আদায় করে না, তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রমযানুল মোবারকের রোযা আদায়ে ত্রুটি করে অথবা মাকরুহ ওয়াত্তে নামায আদায় করে- এসব বলা ইবাদত সম্পর্কিত গীবত। এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে -

এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বললো, “আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি।” যার সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! অমুক ব্যক্তি আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে। আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার সাথে ইনসাফ করুন।” রাহমাতুললিল ‘আলামীন রসূলুল্লাহ ﷺ গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর?” তিনি বলতে শুরু করলেন- “আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াত্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি।” যার গীবত করা হয়েছে তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ত্রুটি করি?” রসূলুল্লাহ ﷺ গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি অসন্তুষ্ট।” রসূলুল্লাহ ﷺ এ কাহিনী শুনে শত্রুতা পোষণকারী গীবতকারীকে বললেন, “উঠো! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছো এবং গীবত করছো, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন।”

(এহইয়াউল উলূম: আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

৬। গোনাহের গীবত:

অমুকে যেনা করেছে, গীবত করেছে, অথবা সে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, অন্তরে সীমাহীন শত্রুতা রাখে, অথবা সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, অমুক মা- বাবাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, অথবা অমুক ব্যক্তি কটুভাষী, অশ্লীলভাষী, অমুক সর্বদা মদ পান করে, অধিকাংশ সময়েই চুরি করে - কারো গুনাহ সম্পর্কে এরূপ বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে -

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কালো হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তওয়াফ কর, তাহলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অত্যন্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত। পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ট নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার গোনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী পাথরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়াদ্র এবং পাথরের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুভ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়।

(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোস্তাখাবুন নাফায়েসঃ আইয়ামু লবীয অধ্যায়)

পঞ্চম ভাগ:

এ ভাগের গীবত ৪ প্রকার-

১. সরাসরি গীবত

২. অনুকরণজনিত গীবত

৩. ইঙ্গিতে গীবত

৪. উপহাসমূলক গীবত

১। সরাসরি গীবত:

কারো নাম উল্লেখ করে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা, তার গীবত করা।

২। অনুকরণজনিত গীবত

কারো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা। যেমন- কেউ খোঁড়া হলে হাঁটতে তার অনুকরণ করা, অন্ধের পিছনে চোখ বন্ধ করে চলা, কেউ অহংকারবশত সিনা টান করে চললে তার অনুকরণে সিনা টান করে চলা।

অনুকরণজনিত গীবত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

"আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করি না, যদিও আমার অনেক কিছু লাভ হয়।"

৩। ইঙ্গিতে গীবত

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা না হলেও এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে যাতে সবাই বুঝে নেয় অমুকের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে সে বা তাদের গীবত করা হলো।

৪। উপহাসমূলক গীবত

প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট কারো আলোচনা হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ বুঝে যায়- অমুকের কথা বলা হচ্ছে, এটাও গীবত। যেমন- কারো আলোচনা আসলে বলা যে, আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে ঐ

গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গুনাহগার। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।

ষষ্ঠ ভাগ:

এ ভাগের গীবত পাঁচ প্রকার -

১. মৌখিক গীবত

২. কানের গীবত

৩. অন্তরের গীবত

৪. অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গীবত

৫. লেখনী দ্বারা গীবত

১। মৌখিক গীবত:

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কয়েক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেলো।” তাঁরা নিবেদন করলেন, “ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! আজ আমরা খাবারই খাইনি।” জবাবে তিনি বললেন, “আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছো।” আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন।

২। কানের গীবত:

কারো গীবত শুনে চুপ থাকা এবং তা প্রতিরোধ না করা কানের গীবত, কেননা, গীবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করা যেন গীবতকে সমর্থন করা।

৩। অন্তরের গীবত:

কোনো নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে, বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ পোষণ অন্তরের গীবত।

৪। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত:

হাত, নাক অথবা অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে দেয়া। যেমন- কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে এরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

অর্থ: প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযাহর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

(সূরা হুমাযাহ:০১)

হুমাযাহ এবং লুমাযাহর অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদ মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মনীষীর মতে হুমাযাহ দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে চোখ এবং হাতের ইশারায় মানুষকে কষ্ট দেয়। আর লুমাযাহ হচ্ছে সে যে মানুষকে মুখের কথার দ্বারা কষ্ট দেয়।

৫। লেখনী দ্বারা গীবত:

কারো দোষত্রুটি, নিন্দা চিঠিপত্রে লেখা, পত্রিকায় প্রকাশ করা, মুদ্রিত করা অথবা স্বরচিত গ্রন্থে হেয় তুচ্ছ করার উদ্দেশ্যে সম-সাময়িক নিন্দাবাদ করা, দোষ বর্ণনা করা ইত্যাদি সবই গীবত।

ইসলামী শরীয়াতে গীবত ও নামীমাহর বিধান

ইসলামী শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী গীবত ও নামীমাহ্ কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; যা মূলত হারাম। এ ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে এবং বিশিষ্ট সাহাবাগণের উদ্ধৃতি রয়েছে এবং সেই সাথে মুসলিম উম্মাতও একমত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সা) গীবতকারীকে ফাসিক অর্থাৎ প্রকাশ্য কবিরাহ গুনাহকারী বলেছেন।

গীবত অকাট্য হারাম এবং হারাম হওয়া সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। গীবতের হারাম হওয়া অস্বীকারকারী কাফের। অর্থাৎ, যে বলবে গীবত হালাল সে কাফের হয়ে যাবে এবং দ্বীনের সহজ সরল পথ থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা গীবত হারাম হওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অনেক হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত এবং গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীবতের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ) এর উপদেশমূলক কবিতা রয়েছে।

গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতের আলোচনাঃ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ ۖ نَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۚ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক অনুমান থেকে দূরে থেকো। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ। আর গুপ্তচরবৃত্তি করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো অসাক্ষাতে নিন্দা না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই কর। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত:১২)

আল্লাহ্ তা'য়ালা গীবতের তুলনা করেছেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে। কারণ, মৃত ব্যক্তি যেমন কেউ তার গোশত ভক্ষণ করলে তা বুঝতে পারে না তদ্রূপ যাকে নিয়ে গীবত করা হয় সেও তার গীবত সম্পর্কে জানতে পারে না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

“আল্লাহ্ তা'য়ালা এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এজন্য যে মৃতের গোশত ভক্ষণ যেমন স্পষ্ট হারাম এবং অপছন্দনীয়, তেমনিভাবে অন্যের গীবত করাও ইসলামী শরীয়াতে স্পষ্ট হারাম ও অন্তরের কাছেও ঘৃণীত।”

(তাফসীর কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ (সা) গীবতকে অপরের গোশত ভক্ষণের ন্যায় বলেছেন:

রসূলুল্লাহ (সা) এর নিয়ম ছিল কখনো সফরে বের হলে এক একজন নিঃস্ব গরিবকে দুই দুইজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গী করে দিতেন। যাতে নিঃস্ব ব্যক্তি ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বয়ের সেবা পরিচর্যা করতে পারে এবং ধনাঢ্য এর দ্বারা গরিবের প্রয়োজন পূরণ করবে। সুতরাং এক সফরে তিনি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) কে দুই ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গী করে দেন। পথিমধ্যে মনযিলে অবতরণ করলে ধনী ব্যক্তিদ্বয় কোনো কাজে চলে যান এবং সালমান (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়েন। তারা দুইজন কাজ শেষে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে সালমান! খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়েছে কি? তিনি বললেন, আমার ঘুম এসে গেছে তাই কিছু প্রস্তুত করতে পারিনি। তারা বললেন, যাও। রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু খাবার চেয়ে আনো। হযরত আলমান (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমার ভাল্ডার রক্ষক ওসামার নিকট যাও এবং কিছু থাকলে নিয়ে আসো। তিনি হযরত ওসামা (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনি বললেন আমার নিকট দেবার মতো কিছুই নেই। হযরত সালমান (রাঃ) ফিরে গিয়ে তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে এ জবাব অবহিত করেন। এ শুনে তারা হযরত ওসামা (রাঃ) এর গীবত করে বললেন, তার কাছে খাবার ছিল কিন্তু সে কার্পণ্য করেছে। অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ) কে বললেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রওয়ানা করে গেলে সঙ্গীদ্বয় তাঁরও কিছু গীবত শুরু করে দেন। এবারও হযরত সালমান (রাঃ) শূন্য হাতে ফিরে আসেন। তখন তাঁর সঙ্গীদ্বয় স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ এর সন্নিধানে গমন করেন। তিনি আগন্তুকদ্বয়কে বললেন, তোমাদের দাঁতে

গোশতের রং লেগে রয়েছে। তারা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ ! আজ আমরা মোটেই গোশত খাইনি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এ মাত্র ওসামা এবং সালমানের গোশত খেয়েছে। কেননা তোমরা উভয়ের গীবত করেছো। আর কারো গীবত করা তার গোশত খাওয়ার নামান্তর। তখনই হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম- “তোমরা একে অন্যের গীবত করো না।” - এ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হন।

সাহাবায়ে কেরাম অন্যের গীবত করায় রসূলুল্লাহ ﷺ এর অসন্তুষ্টি:

একদিন কয়েকজন সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় একজন মজলিস থেকে উঠে - নিজের ঘরে চলে যান। তার প্রস্থানের পর মজলিসে উপস্থিতগণ তার সম্পর্কে বললেন, সে দুর্বল, একেবারেই শক্তিশূন্য। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন যে,
তোমরা তার গীবত করছো।

মুনাফিকদেরকে মুসলমানদের গীবত করতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধঃ

একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দানকালে উচ্চ স্বরে বলেছিলেন -

“হে লোকসকল! যারা মুখে ঈমান গ্রহণ করেছে, কিন্তু অন্তর ঈমানশূন্য তারা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, তাদের দোষ বর্ণনা করো না, লজ্জিত করো না, তাদের গীবত করো না, দোষ অশ্বেষণ করো না। যে কোন মুসলমানের দোষ অশ্বেষণ করে ফিরবে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ অশ্বেষণ করবেন, তাকে লজ্জিত অপমানিত করবেন, যদিও সে নিজ ঘরে লুকিয়ে অবস্থান করুক।”

ঘটনাঃ হযরত মায়েয আসলামী (রাঃ) যেনায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যেনায় জড়ানোর স্বীকারোক্তি করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়েয (রাঃ) কে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেন। উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপের ফলে হযরত মায়েয (রাঃ) চিরস্থায়ী জান্নাতের যাত্রী হলে দুই ব্যক্তি তার গীবত করেন। বললেন, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, অথচ সে নিজেই তা প্রকাশ করে দিলো। যেভাবে পাথর নিক্ষেপে কুকুর নিহত হয়, সেও তেমনি নিহত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গীবত শুনতে পান। কিছুক্ষণ পর পথে একটি মৃত গাধা পাওয়া গেল। সেটি মরে এমনভাবে পচে গিয়েছিলো যে, এক পা উপরে উঠে গেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত গাধাটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কোথায়? সম্বোধিতরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই যে আমরা উপস্থিত রয়েছি। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা যে সবেমাত্র মায়েয়ের গীবত করলে তার বিনিময়ে এ গাধাটি ভক্ষণ করো। তারা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ এ গোশত কে খেতে যাবে? তিনি বললেন,

“তোমরা যে সবেমাত্র মায়েয়ের গীবত করেছো, তা এর চেয়েও ভয়ংকর। এতে এর চাইতেও বেশি গুনাহ রয়েছে। আল্লাহর কসম, মায়েয জান্নাতের নহরসমূহে ডুবাচ্ছে এবং জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করছে।”

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

সেই প্রকৃত মুসলিম, যার জবান (মুখ)ও হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।

(বুখারি)

“প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত,সম্মান ও সম্পদ নষ্ট করা হারাম।”

(সহীহ মুসলিম)

গীবত শ্রবণ করাও হারাম

গীবতে লিপ্ত হওয়া যেমন ইসলামী শরীয়াতে হারাম তেমনই গীবত শ্রবণ করাকেও শরীয়াতে হারাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيتُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ

অর্থ: আর যখন তুমি আমার আয়াতসমূহ নিয়ে বাজে আলোচনায় রত লোকদেরকে দেখবে তখন তুমি তাদের থেকে সরে থাকবে; যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় ফিরে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কিছুতেই জালেম লোকদের সাথে বসবে না।

(সূরা আল-আন'আম:৬৮)

আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসঙ্গে আরও বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পেছনে লেগো না। কান, চোখ ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল:৩৬)

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ ۖ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۖ

অর্থ: তারা যখন বাজে কথা শোনে তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, “আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদেরকে সালাম। আমরা মূর্খদের (সঙ্গ) চাই না।”

(সূরা আল-কাসাস:৫৫)

কেউ যদি গীবতকারীকে তার গীবত থেকে যদি বাঁধা দিতে সক্ষম না হয় কিংবা গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলার পরেও যদি না শোনে ও না মানে, তাহলে তার জন্য উক্ত মজলিশ ত্যাগ করা আবশ্যিক।

গীবত শোনা থেকে বেঁচে থাকার উপায়:

১। গীবত থেকে বেঁচে থাকার নিয়তে, গীবত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন মজলিস এড়িয়ে চলা।

২। গীবত শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাঁধা প্রদান কর:

- হাত দ্বারা - ছোটদের মজলিসে।
- মুখ দ্বারা - সমবয়সী দের মজলিসে।
- অন্তর দ্বারা - বড়দের মজলিসে।

৩। গীবত হওয়ার স্থানে থাকতে বাধ্য হলে, না শোনার ভান করা অথবা দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা করা অথবা অন্যান্য বিষয়ে কথা বলা যাতে গীবত নেই।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও পরিত্রাণের উপায়

(১) শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ :

দুনিয়াবি সামান্য কোন ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে মানুষ শত্রুতে পরিণত হয়। অতঃপর সেই শত্রুতার জেরে গীবতে লিপ্ত হয়। তেমনিভাবে, অন্যের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের ধ্বংস কামনা করে মানুষ নিজে থেকেই গীবত চর্চা শুরু করে।

কোন মজলিশে যদি কোন ব্যক্তির সুনাম বা প্রশংসা করা হয় অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন নিয়ামতের উল্লেখ করা হয় আর তা কোন হিংসুক ব্যক্তি শোনে তখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে ওই ব্যক্তির সম্মান ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে গীবতে লিপ্ত হয়।

এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনে বলেন,

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

অর্থ: নাকি আল্লাহ মানুষকে যা দান করেছেন তার জন্য তারা তাদের হিংসা করে?

(সূরা আন-নিসা:৫৪)

বস্তুত গীবত করার ফলে ওই ব্যক্তির কোনোই ক্ষতি হয় না; বরং গিবতকারী ব্যক্তি তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে আরো মর্যাদায় উন্নীত করে এবং নিজের পুণ্যের (নেকীর) বুলি থেকে গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিতে থাকে ও তার গুনাহের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিতে থাকে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“যদি কোন ব্যক্তি অন্যের ইজ্জত নষ্ট কিংবা অন্যকিছু হরণ করে থাকে, তাহলে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তা নিষ্পত্তি করে নেয়, যেদিন তার কোন দিনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না।”

(সহীহ বুখারী)

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত সে দিন হলো কেয়ামতের দিন; কেননা সেদিন তার মাফ নেয়ার কোনই উপায় থাকবে না।

পরিত্রাণের উপায়:

দুনিয়া ও আখেরাতে হিংসার মারাত্মক পরিণতির কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই হিংসার কারণেই দুনিয়া ও আখেরাতে সে নিজে যেমন ছোট হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার মান-মর্যাদাও অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও হুশিয়ার থাকতে হবে, যেন হিংসার বশবর্তী হয়ে জীবনে উপার্জিত সমস্ত নেকি বরবাদ না হয়ে যায়।

হিংসাকারী মূলত দুইটি ঘৃণ্যতম পাপে লিপ্ত হয়। যথা - হিংসা ও গীবত । আর দুটিরই পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা করো না, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং দোষ ত্রুটিও তালাশ করে বেড়িও না। আর অন্যের বেচাকেনার মধ্যে শরীক হয়ো না (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম বৃদ্ধি করো না; অর্থাৎ দালালী করো না); বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব ঐ ভাইয়ের প্রতি কোন ধরনের জুলুম অত্যাচার করবে না, সাহায্য সহযোগিতাও বর্জন করবে না এবং তুচ্ছও মনে করবে না।”

অতঃপর তিনি স্বীয় বুকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন,

“তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ এবং ইজ্জত হরণ করা হারাম।”

(সহীহ মুসলিম)

(২) ক্রোধ ও প্রতিশোধ :

যদি কোন মানুষ তার সাথে কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে তার অন্তরে ক্রোধের বীজ বপন হয়, ফলে দুনিয়াবী সামান্য কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ নিতে যেখানে সেখানে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়। অথচ ক্রোধ সংবরণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণের উপায় :

ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমার উত্তম ফলাফলের কথা হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। কেননা ক্রোধ সংবরণ ও মানুষকে ক্ষমা করতে পারলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে মান-সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। ফলে আপোষে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে, সুষ্ঠু সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে। শুধু এখানেই সীমিত নয়; বরং দয়াময় আল্লাহ তাআলা পরকালে মহা সুখময় স্থান জান্নাত দান করবেন।

ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা :

ক্ষমা করা মুমিনের মহৎ গুণ এবং এই ক্ষমার ফলে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের চেষ্টা করো যার বিশালতা আসমান ও জমিনের মত। মোত্তাকীদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে; যারা সুদিন ও দুর্দিনে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

(সূরা আলে-ইমরান:১৩৩-১৩৪)

অর্থাৎ, যারা প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেদের রাগ নিবারণ করে। উপরন্তু যালিমকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা এমন চরিত্রের অধিকারী সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

যে ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে গীবত করলো সে তো তার ক্রোধ সংবরণ করলো না। ক্ষমা করতেও শিখলো না।

রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

“যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য কিয়ামত দিবসে সকল মানুষের সামনের কাতারে আহ্বান করবেন। এমনকি তাকে জান্নাতের হ্রদের মধ্য থেকে ইচ্ছামত গ্রহণ করার এখতিয়ার দিবেন।”

(মুসনাদে আহমাদ)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

“সদকার কারণে মাল কোন অংশে কমে না এবং ক্ষমার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কোন বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনুগত হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন।”

(সহীহ মুসলিম)

অতএব, মহান আল্লাহর নিকট এত বড় সম্মানজনক পুরস্কারের কথা কি বিবেকবানদের মনে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করবে না? বিপরীতে মানুষের গীবত চর্চায় লিপ্ত হওয়ার কারণে প্রতিমুহূর্তে গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে এবং অন্যের গুনাহের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিচ্ছে তা কি ভেবে দেখবে না?

(৩) নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় তিরস্কার:

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আপন মুসলিম ভাইকে হীন ও তুচ্ছ মনে করে তার দোষ ত্রুটি এবং অবস্থান নিয়ে তিরস্কার ও উপহাস করে থাকে। যেমন এরূপ বলে যে, আরে অমুক তো গর্দভ, তার বোধ-বুদ্ধি কিছুই নেই। আসলে নিজের প্রশংসা করা ও আপন বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটানোর জন্যই এরূপ বলে থাকে। আবার বলে যে, কারো বিষয়ে সমালোচনা করার অভ্যাস আমার নেই অথবা আমি কারো নামে গীবত করতে চাই না। এতে তার অন্তরের অস্বচ্ছতাই প্রমানিত হয়। অথচ তিরস্কার করে মানুষকে হীন ও ছোট করা ইসলামে হারাম। যদি সে সত্যিই কম জ্ঞান বা বুকের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে তো স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো। এ দুটোই চরম অপরাধ। এ ধরনের জঘন্য অন্যায় ত্যাগ করা অবশ্য জরুরী।

পরিত্রাণের উপায়

নিজের ভ্রাতার পরিধি প্রকাশ করে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অন্যের যে সমস্ত দোষ ত্রুটির কথা মানুষের সামনে বর্ণনা করা বৈধ নয় সেগুলো উপহাস ও তিরস্কারবশত উল্লেখ করা থেকে সাবধান হতে হবে এবং নিজেকে অত্যাচারী হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকেও নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

মানুষ অনেকসময় সামান্য ভেবে এমন কথা বলে থাকে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিশ্চিত হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) বলেন,

“মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় পুণ্যের কথা মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এরই বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে তেমন কোন বড় গুনাহের কথা মনে করে না, কিন্তু এরই কারণে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় অসন্তুষ্টি লিখে দেন।”

অপরদিকে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

অর্থ: হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ অন্য পুরুষকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম। তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না। ঈমানের পর অপনাম বড় খারাপ! যারা তওবা করে না তারাই জালেম।

(সূরা হুজুরাত:১১)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

অর্থ: অতএব, তোমরা নিজেদের সাফাই গেয়ো না। তিনি ভাল জানেন, কে তাকওয়া অবলম্বনকারী।

(সূরা আন-নাজম:৩২)

(৪) মর্যাদায় সমপর্যায়ে পৌঁছলে অহংকার প্রকাশ পায়:

শ্রেণী, পেশা ও স্তরভেদে কোন ব্যক্তি যখন মান-সম্মান, শিক্ষাদীক্ষা অথবা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমপর্যায়ে এসে যায় কিংবা অগ্রগামী হয়ে যায়, তখন নিজের আত্মহংকার ও গৌরব প্রকাশের জন্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে তুচ্ছ ভেবে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়। এর দ্বারা সে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করতে চায়। এরূপ অবস্থা আজকাল আলেম ওলামাদের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়।

এরূপ ব্যক্তি যেভাবে গীবতে লিপ্ত হলো তেমনিভাবে নিজেকে অহংকারী হিসেবেও প্রকাশ করলো। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটিই মারাত্মক অন্যায়।

রাসূল (সাঃ) এর ভাষায় অহংকার হলো - সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

(সহীহ মুসলিম)

অতএব, এরূপ অহংকার এবং অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা কোন মুমিনের জন্য শোভা পায় না।

পরিভ্রাণের উপায়

অহংকার ও হিংসা মানুষের জন্য চরম ব্যাধি এবং আল্লাহর নাফরমানীর অন্যতম প্রধান ধাপ, যা মানুষকে কুফরীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতএব, এর ভয়াবহ পরিণতির কথা সর্বদা চোখের সামনে রাখতে হবে। এর অশুভ পরিণতির কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

রসূলুল্লাহ (সা:) আরও বলেন,

“কিয়ামত দিবসে অহংকারীদেরকে ছোট্ট পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের ‘বুলাস’ নামক জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আশুন তাদেরকে গ্রাস করবে, জাহান্নামবাসীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদের পান করানো হবে।”

(তিরমিযী)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“এমন এক ব্যক্তি ছিল যে দু’টি উন্নত পোশাক পরিধান করে চলতো এবং এই পোশাকের কারণে অহমিকাবশত সে নিজেকে অনেক বড় মনে করতো। এই অহংকারের ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জমিনে তলিয়ে দেন, কিয়ামত পর্যন্ত সে তলিয়ে যেতেই থাকবে।”

অতএব, এ ধরনের জঘন্য অভ্যাস বর্জন করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করা অবশ্যই ঈমানী দায়িত্ব এবং প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

(৫) লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা কেছছা বর্ণনা :

সমাজে এমন বহু লোক দেখা যায়, যারা মানুষকে হাসানোর জন্য কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক এমন বানোয়াট কেছছা কাহিনী বর্ণনা করতে থাকে যে, ওই ব্যক্তির সাথে উক্ত কাহিনীর কোনোই সম্পর্ক নেই। সে কাহিনী সুনামের হোক কিংবা কলঙ্কের হোক তাতে কিছু যায় আসে না। বরং লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বর্ণনা করা। এখানেই শেষ নয়; বরং

কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক গল্প ও নাটকের মাধ্যমে এর চাইতেও মারাত্মকভাবে রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। আসলে সে হাসি তামাশা করতে গিয়ে স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হলো। অতএব, এই ব্যাপারে হুশিয়ার হওয়া দরকার।

পরিত্রাণের উপায়

এ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে আমরা শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ (সা) এর হুশিয়ারী গুনিয়ে দিতে পারি।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“যে ব্যক্তি লোক হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বর্ণনা করে সে ব্যক্তির জন্য পরকালে তার শাস্তির স্থান হবে জাহান্নামের ‘ওয়ায়েল’ নামক এলাকায়, তার জন্যই ওয়ায়েল, তার জন্যই ওয়ায়েল।”

(৬) অন্যের প্রতি কুধারণা:

মানুষ সাধারণত কোন ব্যক্তির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেই তার প্রতি প্রথমত কুধারণা করে। অতঃপর ঐ ধারণার উপর ভিত্তি করেই সন্দেহমূলকভাবে তার নাম উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে হয়তো সে ব্যক্তি উক্ত দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অথবা ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্যের ওপর মিথ্যারোপ করে। ফলে একইসাথে দুই অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায় - কু-ধারণা এবং মিথ্যারোপ। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এই দুটিই মহা অন্যায়।

হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“তোমরা ধারণা করার বিষয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে, কেননা ধারণা করে যা বলা হয় তাই অধিক বড় মিথ্যা।”

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বিরত থেকে। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ। আর গুপ্তচরবৃত্তি করো না।

(সূরা হুজুরাত:১২)

যা সরলভাবে বলতে গেলে, হে আল্লাহতে বিশ্বাসী ও তাঁর শরীয়তের উপর আমলকারীরা! তোমরা কোন ধরনের কারণ ও লক্ষণ ব্যতিরেকে বেশী বেশী কুধারণা থেকে বিরত থাকো। কেননা, যার বাহ্যিক আচরণ ভালো তার ব্যাপারে কুধারণা রাখা পাপ। তোমরা পেছন থেকে মু'মিনদের ছিদ্রাশ্বেষণ করো না। অর্থাৎ, অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।

অথবা, এরূপ বলা যে, অমুক ব্যক্তিও তো আমার সাথে উক্ত কাজে জড়িত ছিল। হতে পারে সে তার দাবিতে সত্যবাদী কিন্তু নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে তা গীবতে পরিণত হয়ে গেল। আসলে তার উচিত ছিলো নিজের ওজর প্রকাশ করা, অন্যের নাম উল্লেখ না করা। অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তি যদি কোন গর্হিত কাজ করেই বসে তাহলে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে ওই অপরাধীর নামসহ অন্যায়টি বর্ণনা করা। আসলে অন্যায়কারীর নাম গোপন রেখে শুধু অন্যায়টি উল্লেখ করা উচিত।

তবে যদি নাম উল্লেখ করা নিতান্তই জরুরি হয়ে থাকে তাহলে তা ভিন্ন পর্যায়ে পড়বে।

পরিত্রাণের উপায়

প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কর্মের হিসাব ও জবাবদিহিতার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখতে হবে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পেছনে লেগো না। কান, চোখ ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সূরা বনী ইসরাইল:৩৬)

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান! যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেটির তুমি অনুসরণ করো না। অন্যথায় তুমি অনুমান ও ধারণারই অনুসরণ করে বসবে। নিশ্চয়ই মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে তার কান, চোখ ও অন্তরের ব্যবহার সম্পর্কে। সে এগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করলে তার সাওয়াব পাবে। আর খারাপ কাজে ব্যবহার করলে তার শাস্তি পাবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরও বলেন,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۚ

অর্থ: সে যে কথাই উচ্চারণ করুক তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত গ্রহরী রয়েছে।

(সূরা কাফ:১৮)

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই বলুক না কেন তা গ্রহণ করার জন্য তার পার্শ্বে একজন পর্যবেক্ষক ফেরেশতা উপস্থিত থাকে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব তার প্রতি কোন ধরনের অত্যাচার করবে না এবং তাকে কারো নিকট সোপর্দও করে দিবে না। আর যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন মেটায় আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রয়োজন মেটান। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা তার বিপদসমূহের মধ্য থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে তারও দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।”

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

অর্থ: এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে, সেও তা দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেই পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।

(সূরা আয-যিলযাল:০৭-০৮)

সুতরাং, যে অণু পরিমাণ ভাল কাজ করে, সে তা দেখতে পাবে।

ফলে যে ব্যক্তি ছোট্ট একটি সরিষা দানার সমপরিমাণ নেক আমল বা কল্যাণের কাজ করবে সে তা নিজের সামনেই দেখতে পাবে।

(৭) অধিক অবসর ও বেকারত্ব:

অর্থসম্পদ, বেকারত্ব ও যৌবনকাল মানুষকে যে কোন ধরনের পাপ কাজের প্রতি পরিচালিত করে। মানুষের যখন কোন কাজ-কর্ম ও কর্মব্যস্ততা না থাকে, তখনই সে বেকার হয়ে পড়ে। আর বেকার সময়টা অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় লোকমাঝে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে কিংবা চা দোকানে। সেখানে যেহেতু তার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই সেহেতু বসে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে মুখরোচক গল্প শুরু করে দেয় এবং মানুষের দোষ-গুণ খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করতে থাকে। আর উপস্থিত জনগণও তার কথাকে গোথাসে গিলতে থাকে।

অনুরূপভাবে, মহিলারাও কোথাও সমবেত হলেই বাধাহীনভাবে বিভিন্নমুখী পরনীন্দায় লিপ্ত হয়ে যায়। এরূপভাবে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই গিবতকারীর শামিল হয়ে যায়।

পরিব্রাজকের উপায়

প্রতিটি মানুষের খুব গভীরভাবে খেয়াল করা উচিত যে, এ জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের ও প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে মহান আল্লাহর দরবারে। অতএব নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিক ইলম অর্জন ও জ্ঞান চর্চার এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল (সা) এর প্রদর্শিত পন্থায় সার্বিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য প্রকাশের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। কেননা এসব বিষয়ে পরকালে অবশ্যই জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান তার রবের নিকট হতে এক কদম চলতে পারবে না। যথা - তার পূর্ণ জীবন কোন পথে শেষ করেছে, তার যৌবন কোন পথে ব্যয় করেছে, তার ধন-সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছে, ঐ সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছে এবং যে ইলম অর্জন করেছিল সেই ইলম অনুযায়ী কি আমল করেছে?”

(তিরমিযী)

অপর একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

“অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতে ধোঁকা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা ও অপরটি অবসর।”

(সহীহ বুখারী)

অর্থাৎ, শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময়কে যথোপযুক্ত কাজে ব্যবহার না করার কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে নসিহত স্বরূপ বলেন,

“পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বেই পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করবে। যথা - বার্ষিক্য আসার পূর্বেই তোমার যৌবনের সময়কে মূল্যায়ন করবে (অর্থাৎ কাজে লাগবে), অসুস্থ্য হওয়ার পূর্বেই তোমার সুস্থ্যতাকে মূল্যায়ন করবে, দরিদ্রতা আসার পূর্বেই তোমার স্বচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করবে, ব্যস্ততা আসার পূর্বেই তোমার অবসর সময়কে মূল্যায়ন করবে এবং তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করবে।”

(মুসতাদরাক হাকেম)

এসব কারণেই ইসলাম ধর্মে মানুষকে কর্মব্যস্ত থেকে হালাল পন্থায় জীবন অতিবাহিত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যেন জীবনের মূল্যবান সময়কে ভালো ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং গীবতচর্চা থেকেও নিজেকে হেফাজত করতে পারে।

(৮)উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নৈকট্য লাভের আশা:

অফিস-আদালত, কলকারখানা কিংবা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট নিজের সুনাম অর্জন করতে বা প্রমোশন বা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির আশায় অন্য কোন কর্মচারী বা সহকর্মীর দোষ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট বর্ণনা করা এবং এর উপরই বেতন বৃদ্ধির বা পদোন্নতির ভরসা করা; এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি যেমন স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হলো তেমনিভাবে গায়রুল্লাহর উপর ভরসা করার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হলো। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুটোই মারাত্মক অপরাধ। অথচ মুমিনদের ভরসার স্থল হলো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা।

পরিত্রাণের উপায়

সর্বপ্রথম তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সেইসাথে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভালো-মন্দ, দুঃখ-কষ্ট, মান-সম্মান ও ধন-দৌলতের সমৃদ্ধি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমেই আসে; কোন মানুষের সন্তুষ্টির মাধ্যমে নয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

অর্থ: তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, “আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে?” তারা অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ্”। বল, “তাহলে আমাকে বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি চান তাহলে তারা কি তাঁর সে ক্ষতি দূর করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমাকে কোন অনুগ্রহ করতে চান তাহলে তারা কি তাঁর সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে?” বল, “আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর ওপরই নির্ভর করে।”

(সূরা জুমার:৩৮)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরও বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ: বলো, “রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দাও, আবার যার কাছ থেকে চাও রাজত্ব কেড়ে নাও; যাকে চাও সম্মানিত করো, আবার যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। তোমার হাতেই কল্যাণ। তুমি সবকিছু করতে সক্ষম। তুমি দিনের মধ্যে রাত ও রাতের মধ্যে দিন প্রবেশ করাও; মৃত থেকে জীবিতকে ও জীবিত থেকে মৃতকে বের করো এবং যাকে চাও বিনা হিসাবে জীবিকা দান কর।”

(সূরা আলে-ইমরান:২৬-২৭)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ
وَأَنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَنْ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ

অর্থ: আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না। যদি (তা) করো তাহলে অবশ্যই তুমি জালেমদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। (হে রাসূল!) আল্লাহ যদি আপনাকে কোন বিপদে ফেলে দেন আর আপনি তা নিজের থেকে সরাতে চান তিনি ছাড়া আর কেউ তা সরাতে পারবে না। তেমনিভাবে তিনি যদি আপনাকে সচ্ছলতা দিতে চান তাহলে কেউই তাঁর অনুগ্রহকে বাধা দিতে পারবে না। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করবেন। তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই। তিনি তাঁর তাওবাকারী বান্দাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা ইউনুস:১০৬-১০৭)

এ ছাড়াও হাদীসে এসেছে,

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের প্রতিই নির্ভরশীল করে দেন।”

(তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আরেক হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন,

“তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কামনা করবে। আর জেনে রেখো! উম্মতের সকল লোক যদি তোমার উপকার করার জন্য সমবেত হয়; তবুও তারা আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত কোনই উপকার করতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে, তারা যদি তোমার কোন

ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়; তাহলেও আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার অতিরিক্ত কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

(তিরমিযী)

সুতরাং, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে তাঁর নিকটই সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গীবতচর্চাও বর্জন করতে হবে।

(৯) নিজের ত্রুটির প্রতি নজর না দেয়া :

সর্বদা নিজেকে অনেক বড় ও দোষত্রুটিমুক্ত মনে করে অন্যের দোষত্রুটি নিয়ে সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া। নিজের ত্রুটির প্রতি দ্রুক্ষেপ না করা। যেমনটি হাদীসে এসেছে,

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“তোমাদের অনেকেই অন্যের চোখের সামান্য খড়-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের উটও দেখতে পায় না।”

(সহীহ ইবনে হিব্বান)

অর্থাৎ, অনেকে অন্যের সামান্য ত্রুটিকে অনেক বড় দেখে আর নিজের মারাত্মক ত্রুটিকেও খুবই সামান্য ত্রুটি বলে মনে করে। এমনকি অনেক সময় ত্রুটি হিসেবে গণ্যই করে না। ফলে সে অন্যের ত্রুটি নিয়ে গীবত এ লিপ্ত হয়।

পরিব্রাণের উপায়

অন্যের ত্রুটি তালাশ না করে বরং আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে রেখে নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সার্বিক দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অতঃপর সেই ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সর্বাধিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে লজ্জিতও হতে

হবে যে, নিজে দোষ-ত্রুটির অধিকারী হয়ে অন্যের ত্রুটি কিভাবে গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করে বেড়াবো?

রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

“তোমরা যদি গুনাহ না-ও করো তবুও আমি তোমাদের উপর এর চাইতেও বড় বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করি, তা হলো অহমিকা!”

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

অর্থ: মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (মানুষকে অবজ্ঞা করো না) এবং জমিনে দম্ভভরে চলো না। আল্লাহ কোন দাস্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

(সূরা লুকমান:১৮)

অতএব, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার অহংকার বর্জন করে গীবত মুক্ত জীবন যাপন করার সার্বিক প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

গীবতের কুফল/ক্ষতি

গীবতচর্চার দ্বারা পার্থিব এবং দ্বীনী উভয় ধরনের ক্ষতির সৃষ্টি হয়। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। গীবত ও নামীমাহর মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়, একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে যায়, মিথ্যা ও কপটতা বৃদ্ধি পায়, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরে, সর্বোপরি, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। শুধু এখানেই সীমিত নয়, বরং এই চরিত্রের অধিকারীগণ নিঃসন্দেহে পরকালে লাঞ্চিত, অপমানিত ও কঠিন শাস্তিরও সম্মুখীন হবেন।

গীবত ও নামীমাহর ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۖ
هَمَّا زٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۖ

অর্থ: না আপনি অধিক হারে বাতিলের পক্ষে শপথকারী ও অপমানিত প্রত্যেক ব্যক্তির অনুসরণ করবেন। যার কাজই হলো মানুষের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে গীবত ও চুগলখুরী করে বেড়ানো।

(সূরা কালাম:১০-১১)

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۖ

অর্থ: প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযাহর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

(সূরা হুমাযাহ:০১)

(১) কবরে শাস্তি ভোগ :

ইমাম বুখারী তার ‘আল আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা একদা রসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি এমন দুই কবরের নিকট আসলেন যে দুই কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছিলো।

অতঃপর তিনি বললেন,

“এই দুই কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদের ধারণা অনুযায়ী কবীরা গুনাহের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু তা মূলত কবীরা গুনাহ ছিলো। তাদের মধ্যে একজন মানুষের গীবত করে বেড়াত আর অপরজন প্রসাবের ছিটে গায়ে পড়াকে অপছন্দ করতো না বা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতো না।”

অন্য হাদীসে গীবতকে কবরের আযাবের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে,

আবু বাকরাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি একদা রসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে চলছিলাম। অতঃপর তিনি দুই কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন,

“কে এমন আছে যে আমাকে খেজুরের একটি তাজা ডাল এনে দিবে?”

ফলে আমি ও অপর এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে একটি খেজুরের ডাল এনে দিলাম। তিনি ঐ ডালটি মাঝ বরাবর ফেড়ে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং ঐ দুই কবরের উপর দুই অংশ রেখে দিলেন এবং বললেন,

“এই ডাল দুটি যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁচা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কবরবাসীর আযাব হালকা করা হবে।”

অতঃপর বললেন,

“গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণে এবং প্রসাবে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে তাদের কবরে আযাব হচ্ছে।”

(মুসনাদে আহমদ)

(২) পরকালে শাস্তি ভোগ :

আনাস বিন মালেক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

“যখন আমাকে উর্ধ্বাকাশে (মেরাজে) নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি এমন এক দল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যে, তারা তাদের হাতে পিতলের নখ দিয়ে নিজ চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছে বা খামচাচ্ছে। আমি বললাম, ‘হে জিবরীলা! এরা কারা?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘এরা মানুষের (গীবত করে) গোশত ভক্ষণ করতো এবং মানুষের মান সম্মান ও ইজ্জত নষ্টের কাজে লিপ্ত হতো।

(মুসনাদে আহমাদ)

(৩) জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত :

হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়াতো। এ খবর বিশিষ্ট সাহাবী হুযায়ফা (র) এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন,

আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেন,

“চুগলখোর (অর্থাৎ একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ানো ব্যক্তি) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

(সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ, আড়ালে নিন্দা ও লাগানি-ভাঙ্গানি ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।

(৪) দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ :

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় গীবতের মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের ত্রুটি প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তায়ালাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার ত্রুটি প্রকাশ করে থাকেন। সে যেমন অন্যের ত্রুটি বর্ণনা করে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালাও তেমনভাবে তারও ত্রুটি প্রকাশ করে তাকে কষ্ট দেবেন। আর মহান আল্লাহ কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করেন না।

হাদীসে এসেছে,

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“তোমরা মুসলিমদের অযথা দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ত্রুটি তালাশ করে, মহান আল্লাহও তার দোষ তালাশ করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা যার ত্রুটি তালাশ করেন, তাকে তার নিজ ঘরেও লাক্ষিত ও অপমানিত করেন।”

(আবু দাউদ)

(৫) অন্যের পাপের বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপে :

পরনীন্দা ও গীবত করা নিঃসন্দেহে জুলুম ও অত্যাচারের শামিল। যার নিন্দা ও গীবত করা হয়, সেই মূলত অত্যাচারিত হয়। এরূপ জুলুম করা হারাম। এ ধরনের অত্যাচারীকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না ঐ অত্যাচারিত বান্দা ক্ষমা না করে। আর দুনিয়ায় নিষ্পত্তি করতে না পারলে পরকালে নিজের নেকী তাকে দিয়ে ও তার গুনাহের বোঝা নিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কিছু নষ্টের মাধ্যমে জুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেইদিন তাদের কোন দিনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে, তাহলে কিয়ামত দিবসে ঐ

অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার নেক আমল নিয়ে মাজলুমকে দেওয়া হবে । আর যদি কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে।”

(সহীহ বুখারী)

(৬) সমাজে ভাঙন ও হিংসা-বিদ্বেষ বিস্তার :

গীবত ও নামীমাহর মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজের ঐক্যে ফাটল ধরে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি পায়, শান্তি-শৃঙ্খলা

বিঘ্নিত হয়, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা হারায় এবং নিজেদের অন্তরে শত্রুতা ও হিংসার বিষাক্ত বীজ রোপিত হয়। এ সবই ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অর্থ: মুমিনরা বস্তুত ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা (তাঁর) অনুগ্রহ লাভ করতে পার।

(সূরা আল-হুজুরাত:১০)

রসুলুল্লাহ (সা) বলেন,

“তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা করো না, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং দোষ ত্রুটিও তালাশ করে বেড়িও না। আর অন্যের বেচাকেনার মধ্যে শরীক হয়ো না (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম বৃদ্ধি করো না; অর্থাৎ দালালী করো না); বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও । একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব ঐ ভাইয়ের প্রতি কোন ধরনের জুলম অত্যাচার করবে না, সাহায্য সহযোগিতাও বর্জন করবে না এবং তুচ্ছও মনে করবে না।”

অতঃপর তিনি স্বীয় বৃকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন,

“তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ এবং ইজ্জত হরণ করা হারাম।”

(সহীহ মুসলিম)

(৭) সৎসাহস হারায় ও আমার বিল মা'রুফের দরজা বন্ধ হয় :

গীবতকারীর অন্তর সর্বদা কলুষিত থাকে। সে কখনোই স্বচ্ছ নিয়তে, সৎ সাহসী হয়ে, সুন্দর ভাষা ও উত্তম আদর্শ নিয়ে কোন মানুষের ত্রুটির কথা সরাসরি সামনে বলার সৎসাহস রাখে না।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

অর্থ: তোমরা (প্রকৃত মুসলমানরা) হলে শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজ করার আদেশ দাও, খারাপ কাজ করতে বারণ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনত তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার আছে, তবে তাদের অধিকাংশই ফাসেক (পাপাচারী)।

(সূরা আলে-ইমরান:১১০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۚ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ভাল কাজ করতে আদেশ দেবে ও খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।

(সূরা আলে-ইমরান:১০৪)

যদি সাহসী হয়ে দোষী ব্যক্তির সামনে এসে সৎ উদ্দেশ্য ও তাকে সংশোধনের আশায় দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হতো, তাহলে হয়তো সে নিজের গুনাহ ও ত্রুটির কথা অনুভব করতে পারতো এবং সংশোধন হওয়ারও আশা করা যেত। সেই সাথে ঐ সাহসী ব্যক্তির ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ অর্থাৎ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর গুরুদায়িত্ব পালিত হতো। ফলে সে আল্লাহর কাছে প্রশংসিত হতো এবং উত্তম প্রতিদানও লাভ করতো। তা না করে বরং কথাগুলো আড়ালে আলোচনা করলে আল্লাহর নিকট গুনাহগার হবে এবং এ অপরাধটি নিজের ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার শামিল হবে। ফলে সর্বোপরি সে গুনাহের হকদার হয়ে গেল।

আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন।

(৮) মুনাফিকী চরিত্র প্রকাশ পায়:

মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুখে ঈমান দাবী করা কিন্তু অন্তরে এর বিপরীত উদ্দেশ্য গোপন রাখা। যারা এরূপ করে তাদের অন্তর ইমানে সিক্ত হয় না। অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকার ফলে তারা গীবত ও অন্যের দোষচর্চায় লিপ্ত হয়।

তাদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) বলেন,

“হে ঐ সকল লোক, যারা মুখে ঈমান এনেছো অথচ তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবতে লিপ্ত হয়ে না এবং অযথা দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি তালাশ করে, মহান আল্লাহ্ও তার দোষ তালাশ করেন। আর আল্লাহ্ তা’য়ালা যার দোষ তালাশ করেন, তাকে তার নিজ ঘরেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।”

(আবু দাউদ)

(৯) ঈমানে অপূর্ণতা আসে:

কোন গীবতকারীর কোন ঘৃণিত বিষয় তার অগোচরে আলোচনা করা হোক, তা কি সে পছন্দ করবে? তা সে কখনোই পছন্দ করবে না। তাহলে সে অন্যের দোষনীয় বিষয় তার অগোচরে আলোচনা করা কেন এত পছন্দ করে? নিজের জন্য যা পছন্দ করে না তা অন্যের জন্য কিভাবে পছন্দ করছে?

অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

“নিজের নফসের জন্য যা পছন্দ করে, তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।”

(সহীহ বুখারী, মুসলিম)

(১০) গীবতকারীর দুর্গন্ধ দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে যায়:

গীবতকারী আল্লাহর নিকট এতই ঘৃণিত যে, এই অপরাধের কারণে তার দুর্গন্ধে দুনিয়ার বায়ু কলুষিত হয়ে যায়, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা একদা রসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে মৃত লাশের দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হলো।

তখন রাসূল (সা) বললেন,

“তোমরা কি জান এটা কিসের দুর্গন্ধময় বাতাস? যারা মুমিনদের গীবতে লিপ্ত হয় এটা তাদের দুর্গন্ধময় বাতাস।”

(মুসনাদে আহমাদ)

(১১) মৃত জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ:

বিবেকবান সচেতন ও জ্ঞান বিকৃত হয়নি এমন কোন মানুষ কখনোই মৃত জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে না। এ কথা ঠিক। তবে ঐ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরাই অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়ে প্রতিনিয়ত মৃত প্রাণীর পঁচা গোশত ভক্ষণ করে নিজেদের উদরপূর্তি করে চলেছে, যা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমরা একদা রসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি কিছু সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন,

“তুমি তোমার দাঁত খিলাল করো।”

সে ব্যক্তিটি বললেন, “আমি তো গোশত খাইনি, কেন দাঁত খিলাল করবো?”

জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন,

“তুমি তো এই মাত্র তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করলে।”

(সহীহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব)

আমর ইবনুল আস (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদা একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গী সাথীদের বলেন,

“কোন মুসলিম ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার (গীবত করার) চেয়ে এই মৃত জানোয়ারের গোশত খেয়ে মানুষের উদরপূর্তি করা অনেক উত্তম।”

(সহীহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব)

সুবহানাল্লাহ! কত মারাত্মক হুশিয়ারী।

(১২) গীবত ও নামীমাহকারী নিকৃষ্ট মানুষ:

গীবত ও নামীমাহতে লিপ্ত হওয়া মানুষেরা হলো আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট বান্দা। এরা মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট করে সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। এ মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

“আল্লাহর উত্তম বান্দাগণ হচ্ছেন এমন যে, তাদেরকে দেখামাত্রই আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দাগণ হচ্ছে এমন যে, তারা শুধু চোগলখুরি করে এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে বেড়ায়। আর পুতপবিত্র স্বচ্ছ মানুষদের কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে।”

(মুসনাদে আহমাদ)

(১৩) মানবরূপী মিথ্যুক শয়তান থেকে সাবধানতা অবলম্বন:

নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসে খুব সুন্দরভাবে মিথ্যা কথা বর্ণনা করে।

যেমন, সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামাতে বর্ণিত হয়েছে যে,

“নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রূপ ধরে কোন সম্প্রদায়ের নিকট এসে মুখরোচক বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলে চলে যায়। ফলে তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে তাদের মধ্যে কেউ বলে যে, জনৈক ব্যক্তি এসব কথা বলে গেলো তার চেহারা চেনা কিন্তু নাম তো জানি না।”

গীবতের বৈধ প্রকারসমূহ

হাদীসবেত্তা ইমাম নববী (রঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে গীবতের ছয় প্রকার বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) গীবতের দশ প্রকার বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন।

১। রাজদরবারে নিম্নস্থদের জুলুমের অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনাঃ

কোনো বিচারক, মুফতী, সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী বা পদস্থ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করলে মজলুম নিজের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করা বৈধ। কেননা শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের না করলে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে হয়তো অত্যাচারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হতে পারে, এতে সবাই তার জুলুম থেকে রক্ষা পাবে, বর্ণিত সব উপকারের কারণে এ প্রকারের গীবত বৈধ।

ঘটনা : রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু লোকের নিকট মেহমানদারী কামনা করে, কিন্তু তারা তা করেনি। এতে মেহমানদারী আকাঙ্ক্ষী যাদের নিকট মেহমানদারী কামনা করেছিল তাদের দুর্নাম রটাতে শুরু করে এবং প্রকাশ্যে তাদের নিন্দাবাদ করতে থাকে। এতে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর উপর রুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ, আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করে অত্যাচারীর গীবত করার অনুমতি প্রদান করেন।

২। দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবতঃ

যদি কেউ কোনো দোষ অথবা গুনাহে জড়িত থাকে তার এ দোষ বা গুনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ, কেননা এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয় সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- কারো মাঝে কোনো দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে পদচ্যুত যা সাবধান করবেন। এতে সকলের উপকার হবে।

ঘটনা: হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ) কে কুফার গভর্নর - নিযুক্ত করেন। কুফাবাসী অনেক ব্যাপারে তার সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করে। অভিযোগসমূহের মধ্যে এক অভিযোগ এটাও ছিল হযরত সা'দ (রাঃ) ভালোভাবে নামাজ পড়েন না এবং নামাজের সূরা কেরাত ভালোভাবে আদায় করেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত সাদ (রাঃ) কে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আম্মার (রাঃ) কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভিযোগকারীদেরকে কিছুই বললেন না। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাদ (রাঃ) কে অভিযোগের ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বললেন, - হে সা'দ! এসব লোক বলছে তুমি ভালোভাবে নামাজ পড় না। জবাবে হযরত সা'দ (রাঃ) নিবেদন করলেন, যখন যোহর, আসর ও এশার নামাজ পড়ি তখন প্রথম দুই রাকআত কেরাত লম্বা করি এবং শেষ রাকআতে কেরাত দীর্ঘ কম করি। রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে নামাজ পড়তেন আমিও সেভাবেই পড়ি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সা'দ তোমার উপর আমার এ আস্থা ছিল। তুমিও রসূলুল্লাহ ﷺ এর মতোই নামাজ আদায় করবে।

এ থেকে জানা গেল, কাউকে দোষমুক্ত করার সদিচ্ছায় তার সম্পর্কে উর্ধ্বতন কারো কাছে অভিযোগ করা বৈধ। তা না হলে কুফাবাসী হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করতেন না আর হযরত ওমর (রাঃ) ও এর প্রতি কান দিতেন না। কেননা গীবত করা আর শূনা সমান অপরাধ।

৩। লজ্জা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গীবতঃ

কেউ কোনো অন্যায়ে লিপ্ত থাকলে এ উদ্দেশ্যে কারো সামনে তার দোষ বর্ণনা করা- যখন সে শুনবে, অমুক আমার অন্যায় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, তখন সে লজ্জায় পড়ে নিজে নিজেই অন্যায় পরিত্যাগ করবে। এরূপ গীবত বা দোষ বর্ণনা বৈধ।

৪। ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবতঃ

মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে কোনো আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলার ধরন প্রকৃতি বলতে কারো দোষ বর্ণনা করায় ক্ষতি নেই, যেমন- কোনো আলেম বা মুফতীর নিকট বলা: “অমুক

আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি দেয় না। আমার আব্বা মারা গেছেন, অমুক আমার অভিভাবক। সে যাবতীয় ধনসম্পদ তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আমাকে কিছুই দেয় না। অতএব, এ অবস্থায় আমি ফতোয়া বা মাসআলা জানতে চাই।” এরূপ বলায় গীবত হবে না।

৫। প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে গীবতঃ

প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে কারো দোষ বর্ণনা করা, তার দুষ্কর্ম প্রকাশ করা বৈধ। যেমন- সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ (সা) এর নিকট অন্যদের দোষ বর্ণনা করতেন। কখনো কখনো তাদের দুষ্কর্মের কথাও প্রকাশ করতেন। কিন্তু কোনো মুসলমানকে অপমান অপদস্থ করা তাদের উদ্দেশ্য হতো না। বরং উদ্দেশ্য হতো রাসুলুল্লাহ (সা) বিষয়টা শুনে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়ে তাকে অবহিত করবেন।

ঘটনাঃ একদিন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এক মেয়েলোকের আলোচনা করে বললেন, “সে অত্যন্ত কৃপণ”; এ শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন, “তার মাঝে কৃপণতার বৈশিষ্ট্য থাকলে সে জাহান্নামী।”

৬। প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবতঃ

যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে যেমন- নামাজ পড়ে না অথবা যেনা করে, মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে অথবা রোযা রাখে না এরূপ ব্যক্তিকে হেয় করার, অপমান অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। তাই আল্লাহভীরু আলেম সমাজ জালেম শাসকদের গীবত করতেন।

৭। হেফাজতের উদ্দেশ্যে গীবতঃ

কারো জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তা অবগত না থাকলে তখন ক্ষতিকারীর গীবত করে ক্ষতিগ্রস্তকে সাবধান করা বৈধ। যাতে তার কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৮। নির্লজ্জের গীবতঃ

যে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার অন্যায় লিপ্ত থাকে এমন নির্লজ্জের গীবত বৈধ। যদি কেউ তাকে মন্দ বলে তাতেও সে প্রভাবান্বিত হয় না, লজ্জা তার কাছে ঘেঁষে না, তার থেকে বহু যোজন দূরে পালায়

৯। আফসোস অনুশোচনাচ্ছলে গীবতঃ

আফসোস অনুশোচনা প্রকাশার্থে গীবত করা বৈধ। যেমন-আফসোস! অমুকে নামাজ পড়ে না। অথবা যেনায় লিপ্ত-এ কারণে তার উপর আমার আফসোস হয়। কেননা তার কারো কাজের উপর আফসোস প্রকাশ ভালো কাজ। বরং কোনো মুসলমানকে গুনাহে জড়িত দেখলে তার অবস্থার উপর এবং শয়তান তার উপর প্রবল হওয়ার কারণে অন্য মুসলমানের তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা এবং তার জন্য দয়াদ্র্চিত্ত হওয়া উচিত।

১০। অপরিচিত ব্যক্তির গীবতঃ

কারো নাম না বলে তার খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা বৈধ। যদি কেউ বুঝতে না পারে কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

১১। দ্বীনের শক্তিবর্ধনের উদ্দেশ্যে গীবতঃ

দ্বীনের শক্তি বর্ধনের উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন- হাদীসবেত্তাগণ একজন আরেকজনের দোষ বর্ণনা করেন। তারা কারো সম্পর্কে লেখেন- অমুক মিথ্যায় অভ্যস্ত, হাদীস বর্ণনায় খুব বেশি মিথ্যা বলে, অমুক হাদীস জাল করায় অভ্যস্ত। এ ধরনের আলোচনা গীবত নয়।

১২। উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে গীবতঃ

মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জীবিত অথবা মৃত কারো গীবত করা এবং গীবতের শাস্তির উল্লেখ বৈধ। যেমন বলা- অমুক জাহান্নামের উপযোগী কেননা সে কৃপণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে যেন কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে।

গীবতকারীকে বাঁধা দেওয়ার ফজীলত

নিজে গীবতের মতো জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকলে যেমন আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করা যায়, তেমনিভাবে সমাজেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়া যায়। কোন গিবনকারীকে বাঁধা দিলেও আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“যে ব্যক্তি কোন স্থানে কোন মুসলিমের মান সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্মত নষ্ট করে অর্থাৎ সম্মান ক্ষুণ্ণ করে, আল্লাহ্ তাকে ঐ স্থানে বেইজ্জত ও অপমানিত করেন যে স্থানে সে তার নিজের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া পছন্দ বা আশা করে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্মত রক্ষায় সাহায্য সহযোগিতা করে বা সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ্ তাকে সেই স্থানে সাহায্য সহযোগিতা করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার আশা করে।”

(আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের কুচক্র থেকে রক্ষা করে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতা প্রেরণ করে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি দোষ ত্রুটি বর্ণনার দ্বারা কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জাহান্নামের উপর কঠিন পুলসিরাতে আটকে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে না পারবে।”

(আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন -

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করে, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।”

(তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেন,

“যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের গিবতকারীকে বাঁধা দেয় বা প্রতিরোধ করে, তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর বর্তায়।”

(মুসনাদে আহমাদ)

সুবহানাল্লাহ! সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে উৎসাহিত করার জন্যই আদর্শ সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ (সা) এ ধরনের লোভনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে কঠিন কথাও বলেছেন।

মা আয়েশা (রা) যখন সাফিয়াহ (রা) এর সম্পর্কে একটু খাটো বলে মন্তব্য করেছিলেন

তখন রাসূল সাঃ বলেছিলেন -

“তুমি এমন মারাত্মক কথা বলেছ, যা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলে সমুদ্র বরাবর হয়ে যাবে।”

(আবু দাউদ)

অতএব, যে ব্যক্তি এই লোভনীয় বিষয়টি লুফে নিতে পারবে এবং কঠিন হুশিয়ারী থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, সেই তো দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে এবং সুন্দর সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে।

এক নজরে পরিত্রাণের উপায়সমূহ

গীবত ও নামীমাহ নিঃসন্দেহে মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মহা পাপ থেকে বাঁচতে হলে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানতে হবে। সেই সাথে এ থেকে বাঁচার জন্য মনের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই অনুভূতি অনুযায়ী আমল করতে হবে।

(১) তাকওয়া:

সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি শক্তিশালী করতে হবে। কেননা একমাত্র এ তাকওয়াই মানুষকে সর্বপ্রকার নাফরমানী ও গুনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাপ কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে যায়, তখনই যদি অন্তরে আল্লাহভীতির প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই সে ওই পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ َ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে (অথবা পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত না হয়ে) মৃত্যুবরণ করো না।

(সূরা আলে-ইমরান:১০২)

রাসূলে কারীম (সা) বলেন,

“তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে আর গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে সাথে সাথেই নেকীর কাজ করবে যেন ঐ গোনাহ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।”

(তিরমিযী)

(২) ভাষা নিয়ন্ত্রণ:

মুখে যা আসবে তা-ই বললে চলবে না বরং প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের প্রতিটি কথাই রেকর্ড হয়ে থাকছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۖ

অর্থ : সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা গ্রহণ করার জন্য) তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।

(সূরা কাফ:১৮)

সাবধান থাকতে হবে যেন এই কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী বিষয়ের (জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের) জামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো।”

(সহীহ আল-বুখারী)

সুতরাং, মুখের কথা এবং যৌনাঙ্গকে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে হেফাজত করতে হবে।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

উকবাহ ইবনে আমের (রা) বলেন, “আমি রসূল (সা) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ! কিভাবে নাজাত পাওয়া যাবে?

তিনি বললেন,

‘তুমি তোমার জিহ্বা তথা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজ বাড়িকে যথেষ্ট মনে করবে এবং তোমার গুনাহের কারণে বেশি বেশি ক্রন্দন করবে।’”

(তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

“মানুষের জিহ্বার কর্মফলই মানুষকে তার মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।”

(তিরমিযী)

(৩) আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় :

প্রতিটি কথা ও কর্ম মহান আল্লাহর নিকট অতি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে রেকর্ড হচ্ছে এবং এই রেকর্ডভুক্ত সকল আমল পরকালে মহান আল্লাহর নিকট প্রকাশ করা হবে এবং এ ব্যাপারে জবাবদিহীও করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّتُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

অর্থ: আর কিতাব সামনে রাখা হবে। তখন তাতে যা রয়েছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের ভীত দেখবে। তারা বলবে, “হায় আমাদের কপাল! এ কেমন কিতাব? এ যে ছোট-বড় কিছুই

বাদ দিচ্ছে না! বরং সবই গুনে রেখেছে।” তারা যা করেছে তা সবই উপস্থিত পাবে। তোমার প্রভু কারো প্রতি অবিচার করেন না।

(সূরা আল-কাহফ:৪৯)

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর নিম্নরূপ -

সেদিন আমলনামা রাখা হবে। কেউ তার আমলনামা ডান হাতে পাবে আবার কেউ বাম হাতে। হে মানুষ! তুমি কাফিরদেরকে এ ব্যাপারে আতঙ্কিত দেখবে। কারণ, তারা জানে, তারা কী কুফরি ও পাপ ইতিপূর্বে পাঠিয়েছে। তারা বলবে: হে আমাদের ধ্বংস ও বিপদ! এ আমলনামার কী হলো? সে তো কোন ছোট-বড় আমলই গণে ও সংরক্ষণ না করে ছাড়েনি। সেদিন তারা নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সকল পাপকর্ম লিখিত ও লিপিবদ্ধ পাবে। হে রাসূল! আপনার প্রতিপালক সেদিন কারো উপর যুলুম করবেন না। কাউকে কোন গুনাহ ছাড়া শাস্তি দিবেন না। আর আনুগত্যকারীর আনুগত্যের সাওয়াব তিনি সামান্যও কম করবেন না।

আল্লাহ তা’য়ালা আরও বলেন,

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۚ

অর্থ: আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন; তারপর আমারই ওপর তাদের হিসাবের দায়িত্ব।

(সূরা আল-গাশিয়াহ:২৫-২৬)

আল্লাহ তা’য়ালা অন্যত্র বলেন,

رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْعِتُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ

অর্থ: কাফিররা ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে মরণের পর পুনরুত্থিত করবেন না। হে রাসূল! আপনি এ সব পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে বলে দিন যে, হ্যাঁ আমার রবের শপথ, অবশ্যই তোমরা কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর দুনিয়ার কৃতকর্মের

সংবাদ তোমাদেরকে দেয়া হবে। আর এ পুনরুত্থান আল্লাহর জন্য অতি সহজ। কেননা, তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর হিসাব ও প্রতিদানের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান দানে অবশ্যই সক্ষম।

(সূরা আত-তাগাবুন:০৭)

(৪) আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে হেফাযত করা:

যে সমস্ত কথা ও কর্ম মানুষকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে সে সমস্ত কথা ও কর্ম সার্বিকভাবে বর্জন করে চলার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। কেননা, মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপরই নির্ভর করে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

“ যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে , আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের উপরই নির্ভরশীল করে দেন। ”

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গীবত।

(৫) আত্মসমালোচনা বা নিজের ত্রুটির প্রতি খেয়াল করা:

অন্যের ত্রুটি তালাশ করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের দোষত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করার কাজে মনোনিবেশ করাই সচেতন ও বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা থেকে পরিশুদ্ধ হতে পারলেই সামাজিক মান মর্যাদা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

সাবধান! নিজেকে রোগাক্রান্ত করে অন্যের আরোগ্য অন্বেষণ করবেন না এবং নিজের অন্তরকে কলুষিত করে বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের চেষ্টাও করবেন না। যে নিজেকে ধোঁকা

দেয় সে কখনই অন্যের জন্য হিতাকাজী হতে পারে না। কারণ যার মধ্যে নিজের নফসের জন্য কোন কল্যাণের চিন্তা নেই, তার মধ্যে অন্যের জন্যেও কোন মঙ্গল থাকতে পারে না।

(৬) চরিত্র ধ্বংসের ভয় করা:

কোন ধরনের কথা ও আচরণ দ্বারা যেন কোন ক্রমেই উন্নত চরিত্র বিনষ্ট না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর গীবতের মতো হারামে লিপ্ত হওয়া উন্নত চরিত্র নষ্টের অন্যতম কারণ।

(৭) বিপদ মুহূর্তে মূল সম্বল হারানোর ভয়:

দুনিয়ার জীবনে উপার্জিত পরকালীন পাথেয় নেকীর সম্বল কিয়ামতের ময়দানে কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থায় যেন এই জঘন্য অপরাধের কারণে অন্যকে দিয়ে দিতে না হয়, সেই ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্যকিছু নষ্টের মাধ্যমে জুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেদিন তার কোন দিনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে তাহলে, কিয়ামত দিবসে ঐ অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার নেক আমল নিয়ে মাজলুমকে দেওয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে।”

(সহীহ আল-বুখারী)

অনুরূপভাবে, হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

“জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। এ কথা শুনে তিনি এক বুড়ি আধা কাঁচা-পাকা খেজুর গিবতকারীর নিকট উপহার পাঠান এবং বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি আমাকে অনেক নেকী উপহার দিয়েছেন। এর প্রতিদান স্বরূপ এই

উপহারটুকু আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তবে ওজর পেশ করছি এই জন্য যে, আমি এর বিনিময় পরিপূর্ণভাবে দিতে সক্ষম হচ্ছি না।”

(ইহুইয়া উলুমিদ দ্বীন, ‘নামীমাহ্’ অনুচ্ছেদ)

(৮) অন্যের প্রতি জুলুম না করা:

কারো দোষত্রুটি নিয়ে গীবতে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধরনের জুলুম। এই অত্যাচারের কারণে পরকালে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে আসবে এবং নিজের নেকিসমূহ তাকে দিয়ে দিতে হবে; যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব, মহা বিপদ মুহূর্তে নিজের নেকীর সম্বল যেন এই গীবতের কারণে হারিয়ে না যায়, সেদিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“প্রকৃত মুমিন সেই যার হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে ওপর মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।”

(সহীহ বুখারী)

(৯) নিজে যেমন ভালো ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথেও অনুরূপ ভালো ব্যবহার করা:

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা শুধু একাই অন্যদের থেকে ভালো ব্যবহার ও সম্মান পেতে চায়। কিন্তু অন্যের সঙ্গে ভালো আচরণ কিংবা কাউকে সম্মান দেয়ার কথা মোটেই চিন্তা করে না। এটা বড় অন্যায়। নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকেও সম্মান করতে হবে। অপরের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করলে, অপরকেও প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। তবেই সে নিজের নফসের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।”

(সহীহ বুখারী, মুসলিম)

অতএব, নিজের কোন বিষয় নিয়ে মানুষ গীবতে লিপ্ত হোক এটা যেমন অপছন্দ করবে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়াকেও ঘৃণা করবে।

(১০) সৎ সঙ্গী গ্রহণ:

ভালো-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয়, “সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।” অতএব, সঙ্গী যদি ভালো আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মতো জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।

এজন্যই রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

“সৎসঙ্গীর উদাহরন হচ্ছে আতর বহনকারীর ন্যায় আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরন হচ্ছে কামারশালার ন্যায়। অতএব, আতর বহনকারী হয়তো তোমাকে একটু আতর দিবে অথবা তুমি একটু খরিদ করে নেবে, তাও যদি না হয় তাহলে অন্তত একটু সুগন্ধি লাভ করতে পারবে। আর কামারশালার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, তাতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তুমি ঐ আগুন ও কয়লার দুর্গন্ধ পাবে।”

(সহীহ বুখারী, মুসলিম)

(১১) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন:

অন্যের ধনসম্পদ ও মান-মর্যাদা দেখে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করতে হবে। কেননা এর ফলে নেকী ও পূণ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে। পক্ষান্তরে, যার হিংসা করা হয় তার কোন ক্ষতিই হয় না। এই পরশ্রীকাতরতা মহিলাদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(১২) মরণের স্মরণ:

মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা, গীবতের কারণেও মৃত্যুর পর কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

(১৩) পরকালের পাথেয় সংগ্রহ:

বিভীষিকাময় কিয়ামতের দিনে আসল সম্বল হবে নিজের নেক আমল। অতএব, এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর নেক আমল নষ্ট হবার অন্যতম কারণ হলো গীবত।

(১৪) সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ:

এ মর্মে বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে; তন্মধ্যে দু'একটি উল্লেখ করা হলো -

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র) বলেন,

“তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করবে। কেননা এটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ের মহৌষধ।”

(তাফসীরে কুরতুবী)

হজরত আলী ইবনুল হুসাইন (র) জনৈক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখে বলেন,

“গীবতের বিষয়ে তুমি সাবধান থাকবে। কেননা এই গীবত হচ্ছে মানবরূপী কুকুরের তরকারি (খাদ্য)।”

(প্রাগুক্ত)

আবু আছেন বলেন,

“গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা আমি যখন জানতে পেরেছি তখন থেকে আর কখনোই কারো গীবতে লিপ্ত হই নি।”

(তাফসীরে কুরতুবী)

অন্যদিকে মায়মুন ইবনে সিয়াহ্ এর অবস্থা দেখুন,

মায়মুন ইবনে সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ দিতেন না। তিনি গিবতকারীকে কঠিনভাবে প্রতিহত করতেন এবং বাধা না শুনলে উক্ত মজলিশ ছেড়ে উঠে যেতেন।

(তদেব)

জনৈক ব্যক্তি হাসান আল-বসরী (র) কে বলেন, “আপনি আমার গীবত করেছেন?” জবাবে তিনি বললেন,

“আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঐভাবে পৌঁছেনি যে, আমি আমার নেকীতে আপনাকে অংশীদার করবো।”

(ইমাম নববী, আল-আযকার)

অর্থাৎ, গীবত করলে নিজের নেকী দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। অতএব, নিজের নেকী কাউকে দিতে চাই না।

ইবনুল মুবারক (র) বলেন,

“আমি যদি কারো গীবতে লিপ্ত হতাম তাহলে আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কেননা তারা দুজনই আমার নেকী পাওয়ার অধিক হকদার।”

(তদেব)

(১৫) খালেস অন্তরে তওবা করা:

গীবতের মতো মহাপাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই তওবা করতে হবে। কেননা, গীবত হচ্ছে কবির গুনাহ এবং কবির গুনাহ তওবা ব্যতীত কখনোই মাফ হয় না। কৃত অন্যায়ের জন্য যেমন তওবা করতে হয়, তেমনিভাবে ভালো আমল বেশি বেশি করতে না পারার কারণেও তওবা করা দরকার। আর শুধু মুখে তওবা ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বললেই পরিপূর্ণ তওবা হয় না; বরং কুরআন সুন্নাহের আলোকে বর্ণিত শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে তওবা করতে হবে। সেই সাথে ভবিষ্যতেও উক্ত পাপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

তওবার শর্তাবলি

তওবার জন্য উলামায়ে কেরাম কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্তারোপ করেছেন। সেই শর্তাবলী পালন করা ব্যতীত মহান আল্লাহর নিকট তওবা গৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না।

উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

- গুনাহের কাজ বর্জন করা
- অতীত অপরাধের কারণে অনুশোচনা করা
- অতীত পাপকার্য পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করা
- অন্যায়ভাবে নষ্টকৃত সম্পদ ও সম্মান মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া।

গীবতের কাফফারা

গীবতের মাধ্যমে দুইটি বড় গুনাহ করা হয়:

(১) প্রথমত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করা হয়।

(২) দ্বিতীয়ত, বান্দার হুকুম নষ্ট করা হয়।

তাই, কাফফারা হিসাবে যে কাজগুলো করা যায়:

১। তওবা করা:

মুখে ইস্তিগফার, অন্তরে লজ্জাবোধ, চোখে পানি সহকারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে গীবত না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২। বান্দার হুকুম নষ্ট করার কাফফারা:

বান্দার হুকুম নষ্ট করার কাফফারা হিসেবে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যেমন :

১ম দলের মতে: শুধু তওবা-ইস্তিগফার করলেই হবে।

২য় দলের মতে: যার নামে গীবত করা হয়েছে তাঁর কাছে সম্ভব হলে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে ফিতনা-ফ্যাসাদের আশংকা অথবা ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তাঁর নামে বেশি বেশি প্রশংসা করা, আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তার জন্য সাদাকাহ করা এবং তার কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করতে হবে। এ দলের মতামত অনুসরণ করাই অধিকতর পছন্দনীয়।

৩য় দলের মতে: যার নামে গীবত করা হবে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া জরুরী।

৪র্থ দলের মতে: গীবত করা সম্পর্কে যদি সে ব্যক্তি জানতে পারে যে আমাকে নিয়ে গীবত হয়ে গেছে, তাহলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া। সে ক্ষমা করে দিলে ক্ষমা হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। আর না জানতে পারলে ২য় দলের মত অনুসরণ করতে হবে।

সুতরাং, উল্লিখিত আলোচনার আলোকে আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় চরিত্র সংশোধনের তাওফিক দান করেন এবং পরকালীন ভীষণ শাস্তি থেকে হেফাজত করেন-আমীন।